ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বিলোপ ও সমকামী মানুষদের লড়াই : একটি পর্যালোচনা

বিশ্বনাথ সরকার

সারসংক্ষেপ

যৌন রুচি মানুষের একান্ত নিজস্ব বিষয়, মানুষ তা নিয়েই জন্মায়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের সেই সহজাত রুচিকেই ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় ফৌজদারি অপরাধের তকমা দেওয়া হয়েছে। সমকামী যৌন সম্পর্ককে সেখানে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলা হয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে যৌন প্রবৃত্তি ছাড়াও লিঙ্গ পরিচয়ের বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িত। আইন পরিবর্তিত হলেও প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার থেকে সমকামী মানুষেরা এখনও ব্রাত্য। ফলে, সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামীদের সুরক্ষা, বিবাহ, উত্তরাধিকার, দত্তক সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে সাংবিধানিক স্বচ্ছতা দরকার। এখনও The World Values Survey (2006) থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এই সমীক্ষা অনুযায়ী ৪১ শতাংশ ভারতীয় তাদের প্রতিবেশি হিসেবে কোন সমকামীকে চাননা। ৬৪ শতাংশ ভারতীয় আবার কোনভাবেই সমকামকে সমর্থন করেন না। শুধুমাত্র সমকামী যৌন পরিচিতির কারণে ভারতে ৫৬ শতাংশ সমকামী মানুষ তাদের কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে হেনস্থা ও বৈষম্যের শিকার হন।[১] ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এখনও LGBTQIA-দের (LGBTQIA Community-Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex and Asexual) নিয়ে 'হোমোফোবিয়া'-য় ভোগেন। এখনও সমলিঙ্গের বিয়েতে কেন্দ্র সায় দিয়ে উঠতে পারেনি। আসলে সমকামিতার শরীর থেকে অপরাধের তকমা তুলে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, পথ এখনও অনেক বাকি। সেজন্য, আধিপত্যকামী যৌন বয়ানের অনুসঙ্গে থাকা এই মানুষগুলির 'না-মানুষ' বা প্রান্তিকতা অনুধাবনে '৩৭৭ ধারা' পাঠও তার ধারাবাহিক মূল্যায়ন একান্ত জরুরি।

সূচক শব্দ: *ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা, সমকামিতা, উভকামিতা, রূপান্তরকামিতা, যৌন পরিচিতি, ব্যক্তিগত পরিসর।*

ভূমিকা: জীবনের সাথে যৌনতা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যৌনতার ক্যানভাসটা অনেক বড়, অনেক প্রশস্ত। গোটা জীবন জুড়ে রয়েছে যৌনতা। সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, ভাললাগা, হতাশা, ব্যর্থতা, সৃজনশীলতা ও ধ্বংসাত্মক কাজের পেছনে রয়েছে যৌনতার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ছোঁয়া।[২] সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তির সুবিশাল ক্যানভাসে যৌনতা এক রকমের নয়। সাধারণভাবে যৌনতার চারটি অভিমুখ লক্ষ্য করা যায়। যথা-বিষমকামিতা (heterosexuality), সমকামিতা (homosexuality), উভকামিতা (bisexuality) ও রুপান্তরকামিতা (transsexual/transgender)। মানব সমাজের আধিপত্যকারী, একমাত্রিক ও একপাক্ষিক বিষমকামী যৌনবিধির পাশাপাশি বা সমান্তরালে অন্য যৌন পরিচয়গুলিও আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। সমকামিতা কোনও হঠাৎ উদ্ভব হওয়া বিষয় নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে বৃহত্তর মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষমকামী ধাঁচার একবগ্গাগামি প্রবৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য যৌন অভ্যাসগুলিও লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা। যদিও, বিষমকামী যৌন অক্ষের বিপরীতে সমান্তরাল যৌন পরিচিতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে উল্লেখিত তিনটি স্বতন্ত্র চৌহদ্দির মধ্যে এদের আটকে রাখা সব সময় সম্ভব হয় না।

এই প্রবন্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা থাকা না থাকার পাশাপাশি বিষমকামী মূলধারার প্রান্তে থাকা সমকামী জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মূল উদ্দেশ্য এই নয় যে, সমাজের মূলস্রোত যেন সমকামীদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হয় বা তাদের যন্ত্রণা, ব্যথাতুরতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অথবা সমকামী প্রান্তিক পরিসরের প্রেক্ষিত থেকে উদ্ভূত তথ্যকে অভিনব, অনন্য বলে দাবি করে তাদের জীবনের এক তথ্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, সত্য বয়ান নির্মাণের মাধ্যমে বিষমকামের চলতি বিধিব্যবস্থাকে সংশোধন, সংস্কারের মধ্যদিয়ে আরও সহনীয়, বাসযোগ্য বা সমদর্শী করে তুলতে চাই। বরং, সমকামী জীবনের ধরনধারণ, তাদের জীবন-বিশ্বের দিকে ফিরে তাকানো, ফিরে ভাবার প্রয়োজন; কারণ, আমরা যৌন আত্মপরিচিতির, অন্তরঙ্গতার চলতি ধারণার আধিপত্যকে ভালো করে চিনতে, বুঝতে ও তার পুনর্মূল্যায়ন করতে চাই। যে চাওয়া, প্রবেশকামী, আত্মসাৎকারী, পীড়নকারী, দমনমূলক, দখলদার যৌন পরিচয়ের আঙিনা থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে কোন কোমল পরশ, আশ্লেষ ও পারস্পরিক বিনিময়ের এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। যেখানে থাকবে বা থাকতে পারে সংলগ্নতা, সংঘবদ্ধতা বা যৌথ সেবাযত্নে সিক্ত গোষ্ঠীনির্ভর এক সম্পর্কের আবেশ।

সমগ্র গবেষণা প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে মূলত মাধ্যমিক স্তরের তথ্য ও 'ডকুমেন্টস্টাডি' পদ্ধতির উপরে ভিত্তি করে। মাধ্যমিক স্তরের তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলত প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও দৈনিক সংবাদ পত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সমকাম ও ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা:

বাংলায় 'সমকামিতা' শব্দটি এসেছে 'সমকামী' নামক বিশেষণ পদ থেকে। আর এই 'সমকামী' শব্দের উৎস নিহিত রয়েছে সংস্কৃত "সমকামিন" শব্দের মধ্যে। যে ব্যক্তি সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন তাকে 'সমকামিন' বলা হত। 'সম' উপসর্গপূর্বক 'কাম' শব্দের সঙ্গে 'ইন' প্রত্যয় যোগ করে 'সমকামিন' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজিতে সমকামিতাকে বলে 'homosexuality'। গ্রীক শব্দ 'homo' এবং লাতিন শব্দ 'sexus' থেকে ইংরেজীতে এই শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। একই ধরনের দু'জনকে বোঝাতে 'homo' শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং 'sexus' কথার অর্থ যৌনতা। অর্থাৎ সমলিঙ্গের প্রতি যারা যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন তাদের এই প্রকৃতিকে সমকামিতা বা 'homosexuality' বলে।

সমকামিতা প্রধানত দু'ধরনের- জন্মগত ও আচরণগত। জন্মগত সমকামী কৈশোরে যৌনতার উন্মেষকালে সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন। এই আকর্ষণ সহজাত মনো-দৈহিক অপরিবর্তনীয় প্রবণতা। অন্যদিকে, আচরণগত সমকামী আসলে বিষমকামী। ক্ষণিকের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সে সমলিঙ্গের কোন ব্যক্তিকে বিষমলিঙ্গের মানুষ বলে কল্পনা করে তার সাথে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হন। ফলে, আচরণগত দিক দিয়ে একে সমকামী বললেও, যৌনপ্রবণতায় এই মানুষটি বিষমকামী। বিপরীত লিঙ্গের মানুষ পেলে আচরণগত সমকামিতা কমে আসতে পারে। সমকামিতা সম্পর্কিত গবেষণার প্রথম দিকে একে এক বিশেষ ধরনের অসুস্থতা বলে অভিহিত করা হত। এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে অনেকে আবার একে কামবিকৃতির পর্যায়ে ফেলতেন। ফলে, চিকিৎসার নামে নিদারুন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার হতেন সমকামী মানুষরা। পাশাপাশি রচিত হত বা করা হত 'না-মানুষ' হিসেবে প্রান্তিকায়নের বয়ান। বিষয়টি যেহেতু স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই মুলস্রোতের কাছে তা উপেক্ষিত। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানা কারণে অনেকের কাছেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজে, ধর্মশাস্ত্রে ও রাষ্ট্রীয় আইনে এর কোনও অনুমোদন নেই। অপরাধ, বিকৃতি ও অস্বাভাবিক বলে এর গায়ে নানাধরনের তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক সময় এই ভিন্নধারার যৌন প্রবণতার অস্তিত্বকে স্বীকারই করা হয় না।

উনিশ শতক পরবর্তী নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণা ও রচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসতে থাকে সমান্তরাল যৌনতার নানা অবস্থার কথা। প্রাচীন গ্রীস থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমান্তরাল যৌনতার স্পষ্ট উপস্থিতির

প্রমাণ পাওয়া যায়। K.J. Dover-এর Greek Homosexuality (1978) গ্রন্থ থেকে প্রাচীন গ্রীসে বয়স্ক পুরুষদের বালকদের প্রতি উপগত হওয়ার কথা জানা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র গ্রন্থে পুরুষ রুপান্তরকামীদের 'ঔপরিষ্টক' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা নানাবিধ উপায়ে যৌনকর্মী হিসেবে পুরুষদের মনোরঞ্জন করতো। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণেও সমকামের কথা সূক্ষ্মভাবে বিধৃত আছে। নৃতাত্ত্বিক ও পর্যটকদের রচনা থেকেও বিভিন্ন দেশের সমকামী মানুষের জীবনচর্য্যার অনেকগুলি দৃষ্টান্তের কথা জানা যায়। যেমন- ওমানের 'জানিথ', সুদানের 'জার', মিশরের 'খাওয়াল', থাইল্যান্ডের 'কাথোই', চীন ও তাইওয়ানের 'তংজি', অ্যাঙ্গোলার 'চিবাদোস', ইন্দোনেশিয়ার জাভা অঞ্চলের 'লুড্‌রক' প্রভৃতি সম্প্রদায় হল দেশজ সংস্কৃতি ও সামাজিক অনুশাসনের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সমকামী মানুষদের এক একটি গোষ্ঠী। প্রতিটি দেশের ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমন্ডলে, রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা ও সমাজ-সংস্কৃতির চৌহদ্দির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় এদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে।

বাস্তব প্রেক্ষিতে 'সমকামিতা' শব্দটির সাধারণ ও বিশেষ এই দু'টি অর্থ দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ অর্থে সমকামিতা সমান্তরাল যৌনতার সমার্থক। সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে আমরা সমকামিতা শব্দটি ব্যবহার করি। রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা প্রভৃতি যৌনতার বিভিন্ন রূপ ও পরিচয় সমকামিতার পর্যায়ভুক্ত। বস্তুত সমকামিতার সাধারণ অর্থের মধ্যে সমান্তরাল যৌনতার সমস্ত রূপই ধরা পড়েছে। অন্যদিকে, সমকামিতা যখন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তার ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তখন কেবলমাত্র সমান্তরাল যৌনতার একটি নির্দিষ্ট রূপকেই চিহ্নিত করা হয়। এই নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে বিষমকামিতার কোন চিহ্ন নেই। এখানে কোনও ব্যক্তি নিজেকে বিষমলিঙ্গের মানুষ হিসেবে কল্পনা করেন না, সমলিঙ্গের যৌনসঙ্গীকে বিষমলিঙ্গের সদস্য হিসেবে ধরে নেন না বা পর্যায়ক্রমে সমলিঙ্গ ও বিষমলিঙ্গের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন না। আসলে সমকামিতার এই সংকীর্ণ পরিসরে বিষমকামিতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। ইংরেজীতে ওথা (পুরুষ সমকামী) ও Lesbian (স্ত্রী সমকামী) শব্দদুটি সমকামীর সমার্থক। প্রথম দিকে যৌন ব্যভিচার ও নারী যৌনকর্মীর প্রতিশব্দ হিসেবে ওথা শব্দটির প্রচলন হয়। পরে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটেনের সমস্ত সমকামীরা নিজেদের মানসিকতাকে বোঝাতে ওথা শব্দটি ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে, প্রাচীন গ্রীসের লেস্‌বস্ দ্বীপে সমলিঙ্গের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত Sappho নামে এক নারী বাস করতেন। পরবর্তীকালে এই দ্বীপের নাম অনুসারে সমলিঙ্গের প্রতি আসক্ত সমস্ত নারীই Lesbian বলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি পুরুষ সমকামিতার ব্যাপক রূপকে বোঝাতে MSM (Men who have sex with men) শব্দবন্ধটি চালু হয়েছে। Gay হল MSM-এর একটি বিশেষ রূপ বা অংশ মাত্র। অর্থাৎ, সমকামিতার সাধারণ অর্থ বা সমান্তরাল যৌনতার দুটি ভাগ হল-স্ত্রী-সমকামিতা এবং পুরুষ সমকামিতা। MSM হল পুরুষ সমকামিতার সামগ্রিক রূপ।[৩]

বিষমকামিতার পাশাপাশি সমান্তরাল যৌন পরিচয়ের বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সে ভাবে ছিল না। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় প্রথম যৌন পরিচয়ের স্থানে নারী, পুরুষের পাশাপাশি 'অন্যান্য' বা 'other' বিভাগটি যুক্ত করা হয়। সেখান থেকে উঠে আসে, সমগ্র ভারতে সমান্তরাল যৌন পরিচয়ে অবস্থান করেন ৪.৯ লক্ষ মানুষ।[৪] কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকে আধিপত্যকারী বিষমকামী যৌনবিধির পাশাপাশি আবহমানকাল ধরে চলে আসা সমান্তরাল অন্য যৌন পরিচয়গুলির সামনে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা ছিল হুমকি স্বরূপ। সেজন্য, আধিপত্যকামী যৌন বয়ানের অনুসঙ্গে থাকা এই মানুষগুলির 'না-মানুষ' বা প্রান্তিকতার অনুসন্ধানে '৩৭৭ ধারা' পাঠও মূল্যায়ন আমাদের নতুন দিক নির্দেশ দিতে পারে।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর রানি ভিক্টোরিয়ার আমলে লর্ড ম্যাকাউলে (Lord Macaulay)-এর সভাপতিত্বে ব্রিটিশ ভারতের ভারতীয় আইন কমিশন ভারতীয় দন্ডবিধির সাথে ৩৭৭ ধারাটি চালু করেছিলেন।[৫] ব্রিটিশ প্রণীত আইনের

৩৭৭ ধারা অনুযায়ী ভারতে সমকাম ছিল একটি শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী হলেও, ধারাটি রেখে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি কার্যকরী হওয়া ভারতীয় সংবিধানের ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা [Section 377 of the Indian Penal Code (IPC)] অনুযায়ী সমকামকে অপ্রাকৃত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হত। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্য কোনও পুরুষ, মহিলা বা পশুর সাথে প্রকৃতি বিরুদ্ধ শারীরিক যৌন মিলন করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা দশ বছর মেয়াদের কারাদন্ডের সাজা ও জরিমানাও হতে পারে। তবে, এই অপ্রাকৃত অপরাধের জন্য যৌন মিলনের সময় 'অনুপ্রবেশ' বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়।[৬] ৩৭৭ ধারা এখনো বলবৎ আছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে যৌন সম্পর্ক, অসম্মতিমূলক যৌন ক্রিয়াকলাপ এবং পশুর সাথে যৌনক্রিয়ার উপরে।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষের ব্যক্তিগত যৌন আচরণকে অপরাধ বানিয়ে, রাষ্ট্র তাঁদের অস্তিত্ব, তাঁদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা? ভারতবর্ষে ধারা ৩৭৭-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু নাগরিকের মর্য্যাদা প্রদাণ ও প্রকৃত মানবতার অনুশীলনে কোন ফাঁক থেকে যাচ্ছে কিনা সেটাও ভাবা দরকার।[৭]

আত্মপরিচিতি, ব্যক্তিগত পরিসর ও এলজিবিটি আন্দোলন:

'sex' ও 'gender' সম্পর্কিত আলোচনা সমান্তরাল যৌন মানসিকতাগুলিকে বোঝবার ক্ষেত্রে নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছে। বস্তুত 'gender' সম্পর্কিত ভাবনা যত ঋদ্ধ হয়েছে, ততই সনাতনী লিঙ্গবৈষম্যের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। 'gender' একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণ। একে সাংস্কৃতিক লিঙ্গ বলা হয়। অন্যদিকে 'sex' একটি জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় ধারণা। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার হাত ধরে নারী 'নারী' ও পুরুষ 'পুরুষ' হয়ে ওঠে। সমাজ ও সংস্কৃতি আরোপিত নারী-পুরুষ উভয়ের যে বৈষম্যমূলক ও ভিন্নতর নির্মাণ তা দুই লিঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে দুটি স্বতন্ত্র বলয়। আরোপিত এই চৌহদ্দির বাইরে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে, সমস্যা সৃষ্টি হয় সমকামী, উভকামী, রুপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে। এরা যেমন আরোপিত পরিধিতে খাপ খায় না তেমনি আরোপিত পরিধিকে অতিক্রমও করে যেতে চায়। সেইজন্য, লিঙ্গ এবং যৌনতাকে একে-অপরের পরিপূরক করে তোলার যে প্রবণতা যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে, তার বিরুদ্ধে বার বার প্রশ্ন তুলেছেন লিঙ্গসাম্য আন্দোলনকারীরা।

সমান্তরাল যৌনতার একটি বিশেষ দিক হল উভকামিতা। কোন ব্যক্তি যখন সমলিঙ্গ ও বিষমলিঙ্গের প্রতি যুগপৎ যৌন আকর্ষণ অনুভব করে তখন তাকে উভকামী বলে। অন্যদিকে, নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই রূপান্তরকামিতা পরিদৃষ্ট হয়। পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও যারা নিজেদের নারী ভাবেন, তারা হলেন পুরুষ রূপান্তরকামী। আর যেসব নারী নিজেদের পুরুষ হিসেবে ভাবেন, তারা হলেন স্ত্রী-রূপান্তরকামী। যৌনপ্রবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে সব রূপান্তরকামীরা সমকামী। যদিও এরা নিজেদের বিপরীত লিঙ্গগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে মনে করেন। তাই সমকামী না বলে নিজেদের তারা বিষমকামী বলতেই বেশি আগ্রহী। সমকামীদের মতো তাদের মধ্যেও যৌন পরিচয়ের সংকট (sexual identity crisis) আছে। অর্থাৎ সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণের সমস্যায় তারা দীর্ণ হয়। কৈশোরে এই আকর্ষণের ফলে নিজের শারীরিক লিঙ্গ বিষয়ে সমকামীদের নানা প্রশ্ন জাগে। পুরুষের মনে সত্যিই সে পুরুষ কিনা সে বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। নারী চিন্তিত হয়ে ওঠে তার নারীত্ব নিয়ে। পুরুষের আকর্ষণ থাকবে নারীর প্রতি, আর নারীর পুরুষের প্রতি। এর উল্টো হলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই ধন্দে পড়েন। যদিও তার আচরণে বা বেশভূষায় এর কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। রূপান্তরকামীরা যৌন পরিচয়ের (sexual identity) এই সমস্যার পাশাপাশি আর একটি বাড়তি সমস্যার সম্মুখীন হন, তা হল লিঙ্গ পরিচয়ের সংকট (gender identity crisis)।[৮] ফলে সমস্যা শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও। আর এই কারণেই রাষ্ট্রীয়

পরিমন্ডলে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ব্যক্তিগত পরিসর সমকামী মানুষের প্রান্তিকতার বয়ানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনতায় রাষ্ট্র কতদূর হস্তক্ষেপ করতে পারে সে বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে এক পরস্পর বিরোধীতার ক্ষেত্র, বিশেষ করে সমকামী মানুষদের অধিকারকে কেন্দ্র করে, অনেক দিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল। মূলত আধার কার্ডকে প্রায় সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পরেই ফের গোপনতার অধিকারের সেই পুরানো প্রশ্নটি নতুন করে সামনে আসে। ঐ বিষয়ে একাধিক মামলা হয় শীর্ষ আদালতে। এই মামলাগুলির শুনানি চলার একটা পর্যায়ে এসে আদালত গোপনতা আদৌ মৌলিক অধিকার কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা শুরু করে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮ই জুলাই ২০১৭, নয় সদস্যের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চও গঠিত হয়। এই বেঞ্চের নেতৃত্বে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহর। এই সাংবিধানিক বেঞ্চের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন- বিচারপতি জে. চেলমেশ্বর, এস. এ. বোবদে, আর. কে. অগ্রবাল, আর. এফ. নরিম্যান, এ. এম. সাপ্রে, ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, এস. কে. কল, এবং এস. আব্দুল নাজির। ২৪ অগস্ট ২০১৭, বৃহস্পতিবার, পুত্তাস্বামী মামলার রায়ে এই বেঞ্চই জানিয়েছিল, নাগরিকের গোপনতা আসলে তাঁর মৌলিক অধিকার। ঐ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে নাগরিকের গোপনতার অধিকারও। সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় ওই দুটি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আদালতের মতে তাই গোপনতা মৌলিক অধিকারের পর্যায়েই পড়ে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের আট সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ এম. পি. শর্মা মামলায় রায় দিয়েছিল, ব্যক্তিগত গোপনতা মৌলিক অধিকার নয়। পরে, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দেও সুপ্রিম কোর্টের ছয় সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চও খড়ক সিংহ মামলাতেও একই রায় দিয়েছিল। ২৪শে অগস্টের রায়ের ফলে পুরানো ঐ দুই রায় বাতিল হয়ে যায়।[৯]

উল্লেখ্য, গোপনতার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার কিনা তা নিয়ে প্রথম বিতর্ক দানা বাধে ৬০-এর দশকের খড়ক সিংহ মামলাকে কেন্দ্র করে। পুলিশ কনস্টেবল খড়ক সিংহের উপরে সুনির্দিষ্ট কারণে সরকারি নজরদারি চালানো হচ্ছিল। খড়ক সিংহ এই নজরদারির বিরুদ্ধে আদালতের দারস্থ হন। এই নজরদারিতে তার গোপনতা ক্ষুন্ন হচ্ছে তথা মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সুপ্রিম কোর্টের যে ছয় সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ খড়ক সিংহ মামলার বিচার করছিল, সেই বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কিন্তু গোপনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। শুধু বিচারপতি সুব্বা রাও গোপনতাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করলেই দেখা যাবে, গোপনতার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার- নিজের রায়ে এমনই লিখেছিলেন বিচারপতি সুব্বা রাও। কিন্তু বেঞ্চের অন্য সব সদস্যরা তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করায়, তাঁর রায় গ্রাহ্য হয়নি। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মানেকা গান্ধী বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলায় গোপনতার অধিকার সংক্রান্ত বিতর্ক নতুন মাইল ফলকে পৌঁছে গিয়েছিল। ঐ বছর গোপনতার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে রায় দিতে গিয়ে সাত সদস্যের বেঞ্চের অধিকাংশ সদস্যই জানিয়েছিল ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বিচারপতি সুব্বা রাও যে রায় দিয়েছিলেন, সেটাই ঠিক রায় ছিল। অনুচ্ছেদ ২১এর সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়ে বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা জানিয়েছিলেন, গোপনতা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। ফলে, সুপ্রীম কোর্ট ২৪শে অগস্ট, ২০১৭ গোপনতার অধিকারকে যে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দিল, এমনটা নয়।

সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত

স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'[১০] আর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে যে রায় হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে আরও বড় বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, সর্বসম্মতির ভিত্তিতে বললো সেই একই কথা, 'গোপনতার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার'। কিন্তু এখানেই সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, গোপনতার অধিকার অনিয়ন্ত্রিত বা অপরিমিত হতে পারে কিনা। তাঁর মতে, 'শুধু গোপনতার অধিকার নয়, কোনও মৌলিক অধিকারই অনিয়ন্ত্রিত বা অপরিমিত হতে পারে না। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে, অপরাধ দমনের স্বার্থে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার তাগিদে রাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত নানা রকমের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। তার জন্য অনেকের গতিবিধির উপরেই নজরদারি চালানোর দরকার পড়ে। দেশের সিংহভাগ নাগরিককে নিরাপদে রাখতে, কোনও কোনও নাগরিকের কার্যকলাপে বা ব্যক্তিগত পরিসরে অনেক সময় রাষ্ট্রকে উঁকি দিতে হয়। সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থেই সেই অধিকার রাষ্ট্রের থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়।'[১১]

কিন্তু ২৪শে অগস্ট, ২০১৭ সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তার সাথে খুব পরিষ্কার ভাবে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারার একটা স্পষ্ট বিরোধ আছে। ৩৭৭ ধারায় সমকামিতাকে ফৌজদারি অপরাধ বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত গোপনতার অধিকারকে যদি নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলে মেনে নিই, তাহলে নাগরিকের যৌন জীবনে রাষ্ট্র উঁকি দিতে পারে কিনা, সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কারণ, যৌনতা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক কী ধরনের যৌন সঙ্গম করবেন, কার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করবেন, তা নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। নাগরিকের জীবনের সেই গোপন পরিসরে উঁকি দেওয়ার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নেই। সেই কারণে বিশেষ করে সমকামী মানুষদের অধিকারের স্বার্থে ৩৭৭ ধারা সমালোচনার ঊর্ধ্বে তো নয়ই, উপরন্তু এর পুনর্বিবেচনা বা বাতিল হওয়া উচিত বলে দাবি উঠতে থাকে।

ভারতীয় সংবিধানের আইনি অবস্থানের আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারার বিরোধাভাষ বা সীমাবদ্ধতা খুব স্পষ্ট। যেমন-

(১) ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারাটি মূলত তৈরি করা হয়েছে সনাতন জুডো-খ্রিস্টান (Judeo-Christian) নীতি ও নৈতিক মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে, যা বিষমকামী যৌন সম্পর্ককে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের লক্ষ্যে বিশুদ্ধরূপে কল্পনা করে। সেখানে যে কোন 'অপ্রচলিত' যৌন ক্রিয়াকলাপকে দেখা হয়, "against the order of nature"। এই আইন বলে, সম্মতিসূচক মৌখিক ও পায়ু যৌন ক্রিয়া (oral and anal sex)-কেও অপরাধের আওতায় ফেলা হয় এবং আধুনিক সমাজে এর কোনও স্থান নেই। অনেক সময়, শিশু যৌন নির্যাতনের বিচারে বা সমকামী প্রান্তিক মানুষগুলির উপরে পুলিশি নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবেও এই ধারার অপব্যবহার হয়ে এসেছে। পাশাপাশি এই সংখ্যালঘু যৌন সম্পর্কের অস্বীকার যেমন সমকামী মানুষদের প্রতি নেতিবাচক ও বৈষম্যমূলক বিশ্বাসকে স্থায়ী করতে সাহায্য করেছে, তেমনি HIV/AIDS প্রতিরোধের মতো জন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রচেষ্টাকেও অনেকাংশে পঙ্গু করে দিয়েছে। মূলত ধারা ৩৭৭ সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণি তৈরি করে যারা নিয়মিত ভাবে এই ধারার বিধান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ এবং সরাসরি নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হন। সেই সঙ্গে এটিও লক্ষণীয় এই ধারা সমকামীতাকে নিষিদ্ধ করে না, কেবল নির্দিষ্ট যৌন ক্রিয়াকলাপকে নিষিদ্ধ করে; যাতে সমকামী, বিষমকামী, বিবাহিত, অবিবাহিত যে কেউ লিপ্ত হতে পারেন। কিন্তু 'carnal intercourse against the order of nature' -এর কারণ দেখিয়ে ধারাটি কেবল মাত্র যৌনক্রিয়ায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়।

(২) সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইনের দ্বারা সমান সংরক্ষণের কথা। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে যে, ভারত রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সব ব্যক্তি আইনের চোখে সমান এবং সকলেই

আইন দ্বারা সমান সংরক্ষণের অধিকারী। এই সমতা মানে 'আইনি সমতা', কখনই 'প্রাকৃতিক সমতা' নয়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা মানে একই অবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন সমান ভাবে প্রযুক্ত হবে। কিন্তু ধারা ৩৭৭ এর বিপরীত বক্তব্যকেই তুলে ধরে।

(৩) সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি কেউই নাগরিকদের মধ্যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, যৌন পরিচিতি (sex) অথবা জন্মস্থান বা এর কোনটির ভিত্তিতে বৈষম্য করতে পারবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ভেদাভেদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই অনুচ্ছেদে কিন্তু লিঙ্গ (gender) শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, বলা হয়েছে 'যৌনতার অভিমুখ' (sexual orientation)-এর কথা। অর্থাৎ ব্যক্তির যৌন অভিমুখের প্রেক্ষিত থেকে সাম্য হল বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক মৌলিক অধিকার, যা প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে। এখানেও ধারা ৩৭৭ এর সঙ্গে পারস্পরিক বিরোধিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

(৪) সমকামিতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Section ৩৭৭ IPC) অনুচ্ছেদ ১৯ (১)-এর ক, খ, গ ও ঘ'তে সংবিধান প্রদত্ত স্বাধীনতার অধিকারগুলিকেও লঙ্ঘন করে। বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (ক), শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার স্বাধীনতা (খ), সংঘ বা সমিতি গঠনের স্বাধীনতা (গ) এবং ভারতীয় ভূখন্ডের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাচলের স্বাধীনতা (ঘ)- এই সমস্ত অধিকারগুলি ৩৭৭ ধারার কারণে সমকামী মানুষদের কাছে সীমিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সমকামী যৌন আচরণে যুক্ত থাকার কারণে নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি তার যৌন পছন্দ সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিবৃতি দেওয়া থেকে, অবাধ চলাচলে, সমিতি, সমাবেশে যোগদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।[১২]

গত কয়েক দশক ধরে LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender)/Queer মানুষদের মানবাধিকার ও সাম্যের অধিকারের বিষয়গুলি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই অধিকারগুলির স্বীকৃতি মূলত এই প্রান্তিক মানুষগুলির প্রতি সমতার প্রতিশ্রুতি এবং সর্বজনীন স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। প্রকৃত সাম্য অর্জনের জন্য এই অধিকারগুলি কার্যকর করার অর্থ এলজিবিটি মানুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহীংসতা দূরীকরণের জন্য কাজ করা। কিন্তু ভারতবর্ষসহ সারা বিশ্বব্যাপী এলজিবিটি মানুষদের সম্পর্কে নেতিবাচক আচরণ বা দৃষ্টিকোণ (stigma) মূলস্রোতে তাঁদের অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিবর্তে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন- শিক্ষা, কর্মনিয়োজন, পরিবার, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি থেকে তাঁদের বহিঃস্করণ ঘটিয়েছে। পাশাপাশি এলজিবিটি মানুষদের সাম্যের অধিকার ও অন্তর্ভুক্তিকরণ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও একটি অন্যতম ইস্যু।[১৩]

অন্যদিকে, নারীবাদীদের এলজিবিটি রাজনীতি নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া সাধারণত সমান্তরাল পথ অনুসরণ করে চলে না। পণপ্রথা, ভ্রূণহত্যা, গার্হস্থ্য হিংসা এইসব বিষয় বা ইস্যু নারীবাদী আন্দোলনের মূলে থাকার ফলে এবং এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের কারণে আধিপত্যকারী বিষমকামী যৌন পরিচিতির কাঠামোটি অপরিবর্তীত বা অসমস্যায়িত থেকে গেছে। ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র নারী আন্দোলন (Autonomous Women's Movement) নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ সহিংসতার নিরিখে তাদের সকল পাবলিক বা প্রকাশ্য তর্ক-বিতর্ক ও সেইসঙ্গে সচেতনতার প্রচারাভিযান সংগঠিত করেছে। কিন্তু এলজিবিটি জীবন নিয়ে উঠে আসা প্রশ্নগুলো বন্ধ ঘরে বা প্রাইভেট পরিসরের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। যে নারীবাদীরা এলজিবিটি সম্পর্কের প্রবক্তা বা অনুসরণকারী তাঁরা চিরকালই আন্দোলনের প্রান্তে রয়ে গেছেন। ফলে, ভারতীয় সমাজে এলজিবিটি ও তৎ-সম্পর্কিত বৃহত্তর সম্প্রদায়ভুক্ত (LGBTQIA Community-Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex and Asexual) মানুষদের আন্দোলন বা তাঁদের প্রতি সামগ্রিক বৈষম্যের অবসান কেন্দ্র-প্রান্তের চক্রব্যূহে আজও যে অনেকাংশে আটকে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩৭৭ ধারা সম্পর্কে আদালতের পর্যবেক্ষণ ও ঐতিহাসিক রায়:

সমকামকে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় 'অবৈধ' বলা হয়েছে। ফলে আইন আনুযায়ী সমকাম একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিশ্ব পরিস্থিতি ও সামাজিক সচলতার প্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীর মত ভারতবর্ষেও সংশ্লিষ্ট আইনটির সংশোধনের মাধ্যমে সমকামিতাকে অপরাধ মুক্ত করার জন্য দাবি উঠেছে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে নাজ ফাউন্ডেশন-এর মামলায় এক ঐতিহাসিক রায়ে দিল্লী হাইকোর্ট সম্মতিক্রমে সমকামী সম্পর্ককে মান্যতা দেয়। ঐ রায়ে দিল্লী হাইকোর্ট বলে, ৩৭৭ ধারার 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনকর্ম' সংক্রান্ত অংশটি অসাংবিধানিক। এই রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রীমকোর্টে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের তরফ থেকে বহু আবেদন জমা পড়ে। ১১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সুরেশ কুমার কৌশল বানম নাজ ফাউন্ডেশন মামলায় সুপ্রিমকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে ফের বহাল থাকে ৩৭৭ ধারা। তৎকালীন ইউপিএ সরকার রায় পর্যালোচনার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি পেশ করলেও লাভ হয়নি। এরপর নভতেজ সিংহ জোহর, কেশব সুরি, আমন নাথ, আয়েষা কাপূরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং নাজ ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে কিউরেটিভ পিটিশন দাখিল করেন। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চে তার শুনানি চলেছিল। তবে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের রায়ে আরও বলা হয় যে, সরকার চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন আইন তৈরি করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল বিজেপির নেতৃত্বে চলা এনডিএ সরকার ৩৭৭ ধারা নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার পথে না গিয়ে সিদ্ধান্তের ভার সুপ্রিমকোর্টের বিবেচনার উপরে ছেড়ে দেয়। তবে কেন্দ্রের আর্জি ছিল, কোর্ট যেন ৩৭৭ ধারার সূত্র ধরে সমকামী বিবাহ, দত্তক আইন, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মতো অধিকারের বৃহত্তর প্রশ্নগুলিরও বিচার করতে না বসে। কারণ সেক্ষেত্রে কেন্দ্রকে অবস্থান জানানোর জন্য সময় দিতে হবে। মোদী সরকারের আরও দাবী ছিল, জীবনসঙ্গী বাছার অধিকারের নামে যেন অজাচারের অধিকার দেওয়া না হয়। কারণ তা হিন্দু আইনের বিপক্ষে।[১৪]

এই প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন বিচারপতিদের ও সুপ্রিমকোর্টের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ৩৭৭ ধারার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের (বিচারপতি এ.এম. খানউইলকর, ধনঞ্জয় চন্দ্রচূড়, রোহিংটন নরিম্যান, ইন্দু মলহোত্র) সাংবিধানিক বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অসাংবিধানিক কিনা, সেই প্রশ্নটি সবার প্রথমে খতিয়ে দেখা হবে। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, যদি ৩৭৭ ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়, তবেই সমকামী বিয়ে, লিভ-ইন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠবে। তবে তিনি মেনে নেন যে, ৩৭৭ ধারা ব্যক্তির সংবিধান সুরক্ষিত মর্যাদায় আঘাত করে।

৩৭৭ ধারার সমালোচনা প্রসঙ্গে আইনজীবী রোহতগি বলেন, যৌন রুচি মানুষের নিজস্ব বিষয়, মানুষ তা নিয়েই জন্মায়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের সেই সহজাত রুচিকেই ৩৭৭ ধারায় ফৌজদারি অপরাধের তকমা দেওয়া হয়েছে। সমকামী যৌন সম্পর্ককে সেখানে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলা হয়েছে। তিনি আরও দাবি তোলেন, রূপান্তরকামী, সমকামী, উভকামীদের সুরক্ষা, উত্তরাধিকার, দত্তক সংক্রান্ত অধিকার নিয়েও ফয়সালা হওয়া দরকার। বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় বলেন, বিষয়টির সঙ্গে যৌন প্রবৃত্তি ছাড়াও লিঙ্গ পরিচয়ের বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িত।[১৫] তিনি আরও বলেন, কোন ব্যক্তির যৌন পছন্দ কিম্বা যৌনতার অভিব্যক্তিকে কীভাবে দেখা হবে, সংবিধানের ১৫ নং ধারায় তা স্পষ্ট বলা আছে। দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় এই বিষয়টিকে যে ভাবে ছকে বাঁধা হয়েছে, সেটা সংবিধানের ১৫ নং ধারার পরিপন্থী।

৩৭৭ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা বিচার কালে, ৩৭৭-পন্থী আইনজীবীদের একদল সওয়াল করেন যে, এ ব্যাপারে জনমত কি বলছে সেটাও বিচার্য। বেঞ্চ তা খারিজ করে বলে, এটা গণভোটের বিষয় নয়, সাংবিধানিক নৈতিকতার বিষয়। বিচারপতিদের কথায়, 'আমরা ৩৭৭ ধারাকে সংবিধান প্রদত্ত সাম্যের অধিকার, জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার এবং মতপ্রকাশের

অধিকারের আলোয় বিচার করব।' সেই সূত্রেই বেঞ্চ আরও বলে যে, অপরাধের তকমা গেলে সমকামিতা নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাবে। আদালতের মতে, 'ভারতীয় সমাজে পারস্পরিক সম্মতিতে রচিত সমকামী সম্পর্ক নিয়েও তীব্র বৈষম্যের মনোভাব কাজ করে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যে এর প্রভাব পড়েছে।'[১৬]

Indian Psychiatric Society (IPS)-এর তরফেও এক বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছিল, 'সমকামিতা কোনও মনোরোগ নয়, বিষমকামিতা বা উভকামিতার মতো যৌনতার একটি স্বাভাবিক ভিন্নতা মাত্র।' ৩৭৭ ধারা খারিজের পক্ষে সওয়াল করে IPS আরও বলে যে, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন মনোরোগ সংস্থা এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মনোরোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরাও সেই মতটিকে সমর্থন করি। পাশাপাশি ১৪ই জুলাই ২০১৮ All India Muslim Personal Law Board-ও জানিয়ে দেয় যে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারাটি যদি খারিজও হয়ে যায়, তাহলেও তারা তার বিরোধিতা করবে না। যদিও এর আগে সুপ্রিম কোর্ট এবং দিল্লি হাইকোর্টে যতবারই ৩৭৭ ধারা খারিজের মামলা উঠেছিল, ততবারই ধারাটি বহাল রাখার পক্ষেই সওয়াল করেছিল ল বোর্ড।[১৭]

কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর সমকামকে আইনি অপরাধ-মুক্ত করতে লোকসভায় দু-দুবার বেসরকারি বিল আনার চেষ্টা করেছিলেন। একবার ২০১৫-র ডিসেম্বরে এবং ফের ২০১৬-র মার্চে।[১৮] কিন্তু ভারতীয় সংসদের হোমোফোবিয়া বা সমকামী বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে ছিল যে, সরকার ও বিরোধী সকলে হাত মিলিয়ে বিলটি প্রথমবার উপস্থাপন পর্যন্ত করতে দেয়নি। বেজেপি এমনকি নিজের দলের সবার কাছ থেকেও তিনি সেভাবে সমর্থন পাননি। প্রসঙ্গত, বিল পেশ করলেই তার আলোচনা যেমন নিশ্চিত হয় না, তেমনি বিল আলোচিত হলেও তা পাশ হওয়া আরও কঠিন বিষয়। বহু সাংসদ বিল উপস্থাপনের পক্ষে ভোট দেবেন না বলে সেদিন অনুপস্থিত থাকেন। পরে, ভোটে হেরে সেই বিল আর পেশই করতে পারেননি তারুর।

অবশেষে, ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ঐক্যমতের ভিত্তিতে ৪৯৫ পাতার রায়ে জানিয়ে দিল যে, ভারতবর্ষে সমকামিতা অপরাধ নয়। ফলে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গেল এই রায়। ব্রিটিশ আমলের ১৫৬ বছরের পুরানো দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারাকে অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক বলেও মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। রায় শুনিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র মন্তব্য করেছেন, পুরনো ধ্যানধারণাকে বিদায় জানিয়ে সমস্ত নাগরিকদের সমানাধিকার আমাদের দিতে হবে। বিচারপতি দীপক মিশ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সাংবিধানিক বেঞ্চের অন্যান্য চার বিচারপতিও একই বক্তব্য রেখেছেন। পাশাপাশি তাঁরা আরও জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত পছন্দ স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত। ভারতীয় সংবিধানে এলজিবিটি গোষ্ঠীর সদস্যরা বাকিদের মতো একই অধিকার পাওয়ার যোগ্য।[১৯] সাংবিধানিক বেঞ্চের মতে, ৩৭৭ ধারা সমকামীদের সমানাধিকারে ধাক্কা দিচ্ছে। প্রধান বিচারপতি সমকামিতা সম্পর্কে বলেন, 'আমি যা, আমি তাই। আমাকে সে ভাবেই গ্রহণ করতে হবে।' পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের সদস্যরা চারটি পৃথক রায়ে একই সুরে লিখেছেন, যৌন পছন্দ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই তার ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা সংবিধানের ১৪তম অনুচ্ছেদের বিরোধী। বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি ইন্দু মলহোত্র বলেন, 'বছরের পর বছর সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য এলজিবিটি সম্প্রদায়ের কাছে ইতিহাসের ক্ষমাপ্রার্থনার দায় থেকে যায়।'

৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে সব থেকে বড় প্রশ্ন ছিল, পুলিশ তথা রাষ্ট্র কেন মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে নাক গলাবে? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বলেছেন, সমকামী, রুপান্তরকামী, উভকামী তথা এলজিবিটি সম্প্রদায়ের মানুষেরও নিজের পছন্দ মতো সঙ্গী বেছে নিয়ে, ভালবাসা, যৌনতৃপ্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যেমন রয়েছে আর

পাঁচজন সাধারণ নাগরিকের। নিজস্ব ইচ্ছা প্রকাশের বাধা মৃত্যুর সমান। তাই পুরানো ধ্যানধারণাকে বিদায় জানাতে হবে। ভিক্টোরিয় নীতিবোধের ভিত্তিতে তৈরি আইন দিয়ে সমকামী মানুষদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। রায় ঘোষনা করে প্রধান বিচারপতি বলে, '৩৭৭ ধারা অযৌক্তিক, নিয়মবহির্ভূত এবং বোধাতীত। কারণ এলজিবিটি সম্প্রদায়ের সমানাধিকারে তা হস্তক্ষেপ করে। সমাজের নৈতিক ধ্যান-ধারণা একজন নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না। তাঁর যুক্তি, সংখ্যাগুরুর মত বা সমাজের জনপ্রিয় মত সাংবিধানিক অধিকার বাতলে দিতে পারে না। সংবিধান মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কার পক্ষে মত বেশি, তা দেখে নয়। রায় ঘোষনার পর নাজ ফাউন্ডেশনের কর্ণধার অঞ্জলি গোপালনের প্রতিক্রিয়া ছিল, 'সমকামিতাকে শুধু অপরাধ নয়, রোগ হিসেবে দেখা হত। সমকামিতা সারাতে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হত। তার বিরুদ্ধে আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে যাওয়ায়, কমিশন বলেছিল, এটি আইনত অপরাধ বলে কিছু করার নেই।' শশী তারুর বলেন, 'বহু পুরনো এই ঔপনিবেশিক আইন আজকের আধুনিক সমাজের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বৈষম্যের অবসান ঘটলো।'[২০]

মূলত, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের কৌশল মামলার রায়ের পর থেকেই ভারতবর্ষে এলজিবিটি মানুষদের আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলা ও ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের পুত্তাস্বামী মামলা দুটির রায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ন্যায়ের প্রতি আদালতের সংবেদনশীলতাকে স্পষ্ট করে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের মামলার রায়ে আদালত তৃতীয় লিঙ্গকে পুরুষ এবং নারীর মতোই আর একটি লিঙ্গের স্বীকৃতি দেয় এবং জানায়, সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারে এই লিঙ্গের মানুষদেরও সমান অধিকার আছে। নিজেদের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার অধিকারকেও স্বীকার করে নেয় আদালত।[২১] অন্যদিকে, আইনজীবীরা বলেছেন, ২৪ অগস্ট ২০১৭ সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিগত গোপনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার পরেই বোঝা গিয়েছিল, ৩৭৭ ধারার উপরে এবার কোপ পড়বে। কারণ ৩৭৭ ধারায় পুলিশকে ব্যক্তি পরিসরে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এরপরে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মানসিক স্বাস্থ্য আইনেও কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত সমকামিতাকে আইনত স্বীকৃতি দিয়েছে। বলা হয়েছে, সমকামিতা মানসিক অসুস্থতা নয়। রায় ঘোষণা কালে বিচারপতিরা এই দুটি বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তবে ৩৭৭ ধারায় শিশু ও পশুদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ককে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ভারতীয় দন্ডবিধিতে পুরুষের ধর্ষণ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বিধি নেই। তাই ৩৭৭ ধারা ব্যবহার করে অভিযোগ জানাতে পারতেন কোনও ধর্ষিত পুরুষ। তবে এই আশঙ্কা অমূলক বলে জানিয়েছেন ৩৭৭ বিরোধী আন্দোলনকারীরা। তাদের মতে, পায়ুকাম ও পায়ু ধর্ষণ, এই দুটো সম্পূর্ণ পৃথক। ঠিক যেমন ধর্ষণ ও যৌনমিলন আলাদা। বর্তমান রায়েও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে যে সমকামী সম্পর্ক তৈরি হয়, তাকেই আইনি মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। কোনও ধরনের ধর্ষণকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া, নির্ভয়া ধর্ষণ (২০১২) কান্ডের পরেও ধর্ষণ আইন সংশোধন (২০১৩) করা হয়েছিল। সেখানে মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 'পায়ু ধর্ষণ'কে ধর্ষণের আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

আইনজীবীদের ব্যাখ্যা, সুপ্রিম কোর্ট ৩৭৭ ধারায় সমকামিতাকে অপরাধ মুক্ত করে দেওয়ার পরে পুলিশের সমকামীদের হেনস্থা করারও কোনও ক্ষমতা রইল না। কারণ তা সংবিধান বিরোধী কাজ হবে। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে আরও বলেছে, ৩৭৭ ধারায় যে সব মামলা ঝুলছে, সেখানেও এই বায় বিবেচনা করতে হবে। বিচারপতি রহিংটন নরিম্যান তাঁর রায়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত রকমের গণমাধ্যমে এই রায়ের বিপুল প্রচার করতে হবে। বিশেষত পুলিশকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। এরপর যে সমকামীদের বিয়ে ও অন্যান্য অধিকারও প্রাপ্য, তার ইঙ্গিত দিয়ে বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'সমকামিতাকে অপরাধ মুক্ত করা প্রথম ধাপ। সংবিধান আরও অনেক অধিকার দিয়েছে।'[২২]

নভতেজ সিংহ জোহর মামলায় আদালত কোন ব্যক্তি বিশেষের যৌন পছন্দকে তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অঙ্গ হিসেবে এবং আত্মসম্মান ও স্বাধীকারের প্রকাশ হিসেবে দেখেছে। আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে যে, সমকামিতা কোনরকম মানসিক অসুস্থতা নয়। বিচারপতি নরিম্যান তাঁদের অবস্থানের স্বপক্ষে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মানসিক স্বাস্থ্য আইনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, সেখানে কারও যৌন পছন্দের নিরিখে বৈষম্য না করার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি চন্দ্রচূড় ও মলহোত্র উল্লেখ করেছেন যে, সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে দেগে দেওয়ার অর্থ ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্যের অধিকার লঙ্ঘন করা। কারণ, সমকামী সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের যৌন পরিচয় গোপন করার তাগিদেই চিকিৎসকের কাছে আসতে ইতস্তত করেন এবং সেই কারণেই তাঁরা যৌন সংক্রামক অসুখেও অনেক বেশি আক্রান্ত হন ও ভোগেন।[২৩]

ঐতিহাসিক রায় পরবর্তী অভিমুখ ও সমকাম:

ভারতবর্ষের আইনি পরিসরে সমকামিতা এখন আর আপরাধ নয় এই রায় পরবর্তী অভিমুখ দু-ধরনের, এক, এর পক্ষে এবং দুই, এর বিপক্ষে। রায়ের বিপক্ষে বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী যেমন বলেছেন, সমকামিতা বৈধতা পাওয়ায় এডস বাড়বে।[২৪] এর উত্তরে আগেই উল্লেখিত বিচারপতি চন্দ্রচূড় ও মলহোত্রের বক্তব্য ধার করে বলা যায়, কোনও যুক্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্যের অধিকার লঙ্ঘিত হলে এডস-এর মত মারণ রোগ আরও বাড়বে। কট্টরবাদী সংগঠনগুলি বলে চলেছে, সমকামিতা প্রকৃতির নিয়মের বিপ্রতীপ। তা হলেও ঐ ভ্রান্ত যুক্তির বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা কি প্রতিনিয়তই যাই না? বিজ্ঞানের সৃষ্টিই তো অনেকাংশে প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদে। গরমকালে এসি, কিম্বা ভ্রূনহত্যা সেও তো প্রকৃতিরই বিরুদ্ধাচারণ। বিষয়টা আসলে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ নয়। বিষয়টা হল, প্রকৃতির কোন ক্ষতি না করে বা ন্যূনতম ক্ষতি করে সেই কাজটা মানবজাতির সুবিধার্থে ব্যবহার্য কি না। সমকামে প্রকৃতির কোন ক্ষতিসাধন হয় না। তাই মূলস্রোতের যৌন অনুশীলনের বাইরে গিয়ে যদি কেউ সমকামে পরিতৃপ্ত হন, তা হলে বাকি সমাজের মাথা ব্যাথার যুক্তিযুক্ত কারণটা একেবারেই বোধগম্য হয় না! তাছাড়া সমকামী প্রবৃত্তির মানুষজনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতিই সমকামিতায় আসক্তি- সেটাই তাঁদের প্রকৃতি। ফলে, সমকামী প্রবৃত্তির মানুষের কাছে সমকামিতা তাঁদের শারীরিক ও মানসিক গঠনগত প্রবৃত্তি, প্রকৃতিবিরুদ্ধ একেবারেই নয়।[২৫]

তাছাড়া, নভতেজ সিংহ জোহর বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলার রায়ে প্রথমেই পরিষ্কার বলা হয়েছে, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা নিয়ে মামলায় বিচার বিভাগ স্পষ্ট করে দিতে চায় যে, আর সব ছেড়ে সাংবিধানিক নৈতিকতাই তাঁদের রায়ের প্রধান ভিত্তিভূমি। সংখ্যাগরিষ্ঠের নৈতিকতার বদলে সংবিধানে যে নৈতিকতা স্বীকৃত হয়েছে সেটাকেই মাথায় রাখতে চান তাঁরা। মামলার রায়ের লিখিত বক্তব্যগুলির প্রথম দিকেই প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র বলছেন, 'কোন ব্যক্তির প্রকৃতিগত আত্মপরিচিতিকে তার অস্তিত্বের অত্যন্ত জরুরি অংশ হিসেবে মানতে হবে।' সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৯ ও ২১ অনুচ্ছেদে খুব পরিষ্কার ভাবে যার উল্লেখ আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর লেগে গেলো সাংবিধানিক স্ববিরোধীতা ঘুচাতে। ঐতিহাসিক রায়কে সে কারণে ভারতবর্ষের সমকামী মানুষেরা তাঁদের "দ্বিতীয় স্বাধীনতা"[২৬] হিসেবে উদ্‌যাপন করেছেন।

একটা ব্যাপার এখানে খুব পরিষ্কার। ধরা যাক, এক নম্বর ব্যক্তি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছেন, তা নিয়ে দুই নম্বর ব্যক্তির যদি প্রবল 'নৈতিক' আপত্তি থাকে- সেটা কি দুই নম্বর ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা নয়? ভারতের সংবিধান বলবে, দুই নম্বর ব্যক্তির আপত্তি গ্রাহ্য হতে পারে তখনই যদি সেটা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নীতির পরীক্ষায় পাশ করে। নতুবা সে আপত্তি স্বীকারযোগ্য নয়। মতপ্রকাশের অধিকার থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে কোন বৈষম্য করা চলবে না। আর মতপ্রকাশের ক্ষেত্রেও নাগরিকের কাছে নৈতিকতার একটাই মানদন্ড হওয়া উচিত- সেটা সংবিধান। কোন

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু কারও আলাদা নৈতিকতার সঙ্গে যদি সংবিধানের নৈতিকতার সংঘর্ষ দেখা দেয়, তবে অবশ্যই দ্বিতীয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

লক্ষণীয়- সর্বোচ্চ আদালত যখন মনে করিয়ে দেয়, সাংবিধানিক নৈতিকতা তুলে ধরাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ, তার অর্থ কিন্তু দেশের আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের দিকে একটি প্রত্যক্ষ বার্তা পাঠাতে চায় বিচার বিভাগ। সেই বার্তা কেবল ৩৭৭ ধারার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বার্তাটি প্রথমবার দেওয়া হল, এমনও নয়। ২০১৭-র আধার মামলার রায়েও শোনা গিয়েছিল, নাগরিকের ব্যক্তি-পরিসর এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রশাসনিক যুক্তিতেও রাষ্ট্র সেখানে প্রবেশ করে ছড়ি ঘোরাতে পারে না। নাগরিক কী খাবেন, কী পরবেন, সে সব একান্ত ভাবেই তাঁর নিজের ব্যাপার, আর কারও নজরদারি সেখানে মেনে নেওয়া যায় না। ৩৭৭ ধারা সম্পর্কিত রায় পরবর্তী পর্যায়ে, সমকামী বলে যে সব ঠাট্টা-বিদ্রুপ অহরহ চলছে সেগুলোও সংবিধানসম্মত হচ্ছে না।[২৭] এখানেই দেশের সরকার তথা আইনবিভাগ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরবর্তী করণীয় ঠিক কী তা নির্ধারণের দায় ও দায়িত্ব থেকে যায়। বিচারপতি নরিম্যান ও চন্দ্রচূড় তাদের রায়ে সরকারের এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণও করিয়ে দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক রায়ে আইনের পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, সমকামী মানুষেরা আর একটু সসম্মানে বাঁচবেন সেটাও ঠিক। কিন্তু এই আশাটুকুর বাইরে লড়াই থামার লক্ষণ নেই। অন্যায় আইনে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নির্মূল হলেও যৌথ জীবনে পদে-পদে সমস্যা। এখনও, সমলিঙ্গের বিয়ে, একসঙ্গে ঋণ নিয়ে সম্পত্তি কেনা, সন্তান দত্তক নেওয়া থেকে পরস্পরের জন্য বিমার বন্দোবস্ত করা কোনও কিছুই প্রায় সম্ভব নয়। প্রতি ক্ষেত্রেই বাদ সাধছে সামাজিক চোখরাঙানি। তাই, এবার সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

আদালতের এই রায়ে সমকামী মানুষদের সামাজিক জীবনের ছবিটা আমূল বদলে যাবে, সেই আশা বোধহয় কেউ করেন না। কিন্তু পরিবর্তনের পথে এই রায় এক মস্ত পদক্ষেপ তাতে কোনও সংশয় নেই। তবে, সুপ্রীম কোর্ট সমকামী মানুষদের সামগ্রীক সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। যদিও, ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বৈচিত্রপূর্ণ, বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ধারণা। ফলে, সংগ্রামটা যাঁরা করেছিলেন বা এখনও করছেন, তাঁদের জেনে রাখা দরকার, সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। একটা বিরাট শৃঙ্খলকে সুপ্রিম কোর্ট ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কথা ঠিক। সমকামী নাগরিকদের সামনে আর কোন রাষ্ট্রীয় অবরোধ বা আইনি সমস্যা নেই। কিন্তু, বাধা-বিপত্তি এখনও অনেক রয়ে গিয়েছে। সামাজিক অবরোধ যেমন থাকবে, তেমনি এখনও এলজিবিটি জনগোষ্ঠীকে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখবেন, কটাক্ষ ছুড়বেন, সুযোগ পেলে হেনস্থাও করবেন।

সেজন্য সরকারের দায়িত্ব হল, এলজিবিটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা, তাঁদের আত্মপরিচিতি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যের অধিকার, লিঙ্গ সংবেদশীলতা, শিক্ষা, কর্মনিয়োজন, সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও সহায়ক ভূমিকা পালন করা। পাশাপাশি এলজিবিটি সম্প্রদায়কেও সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে লিঙ্গ ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষে। সমাজের তৃণমূলস্তর পর্যন্ত তাঁদের আত্মপরিচিতি ও অধিকার বিষয়ক সচেতনতা ছড়িয়ে দেবার জন্য সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নিয়ে স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংক্রান্ত সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মনিয়োজনের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রয়োজন, কেননা এগুলি সাধারণ জনমানসে প্রভাব ফেলতে সমর্থ্য হয়। যা পক্ষান্তরে সমাজের মধ্যে চলে আসা এলজিবিটি

সম্প্রদায় সম্পর্কে ঘৃণা, অসম্মান, অগ্রহণযোগ্যতার মত নেতিবাচক মনোভাবের অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পাশাপাশি দলিত, মুসলিম, আদিবাসি প্রভৃতি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির সাথে সংযুক্ত আন্দোলনও আগামীতে নিজেদের অধিকার, দাবী ও আত্ম-পরিচিতির স্বীকৃত ক্ষেত্র নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

তাছাড়া, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক চৌহদ্দিতে সমকামী মানুষদের মতামত, অভিজ্ঞতা, স্বরসহ উপস্থিতি, জননীতি নির্ধারণের এত দিনকার পদ্ধতিকেও বদলে দিতে পারে। সেইসঙ্গে, যৌন প্রবৃত্তির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি সংখ্যাগুরু বিষমকামী মানুষদের যৌক্তিক, মুক্ত, চিন্তাশীল ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। তাদেরকেও অনুশীলন করতে হবে কিভাবে দখলদার, অভ্রান্ত ও একমাত্র যৌন পরিচয়ের আঙিনা থেকে সরে এসে পারস্পরিক বিনিময় ও স্বীকৃতিমূলক সম্পর্কে প্রবেশ করতে হয়। স্ব-গ্রহণযোগ্যতা, সান্ত্বনা, আত্মবিশ্বাস এবং বিকশিত হওয়ার সমান সুযোগ আরও বেশি সাম্যে উপনীত হতে সাহায্য করবে। তবেই, রাষ্ট্রীয় হেনস্থার আশঙ্কা যেমন অতীত হয়েছে (?), তেমনি একদিন সমগ্র ভারতবর্ষের এলজিবিটি ও তৎ-সম্পর্কিত বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মানুষদের সামাজিক হেনস্থাও অতীত হবে। যা হয়তো, পারস্পরিক যৌথ সেবাযত্নে সিক্ত নির্ভরশীল গোষ্ঠীনির্ভর এক সম্পর্কের সহাবস্থানের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১. Lee Badgett– M. V. 2014. ''The Economic Cost of Stigma and the Exclusion of LGBT People- A Case Study of India''. World Bank Document– October– p.8. Web link- https-//documents1. worldbank.org/curated/en/527261468035379692 /pdf/940400WP0Box380usion0of0LGBT0People.pdf (Accessed on 20th August 2022).

২. মজুমদার, অজয়. ও বসু, নিলয়. ২০০৫. সমপ্রেম. কলকাতা: দীপ প্রকাশন, পৃ. ১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০-৪৩।

৪. Lee Badgett, M. V. ২০১৪. op. cit., p. ১৮.

৫. The Indian Penal Code. 2009. New Delhi- Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd.– p. 148.

৬. Bhaskaran– Suparna. 2002. 'The Politics of Penetration- Section 377 of Indian Penal Code'– In Ruth Vanita (ed.) Queering India- Same-Sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society. New York-Routledge– p.17.

৭. Gupta– Alok. 2006. 'Section 377and the Dignity of Homosexuality'– Economic and Political Weekly– Vol. 41– Issue No. 46– November 18– p.44822.

৮. মজুমদার, অজয়. ও বসু, নিলয়. প্রাগুক্ত, পৃ.১০২-১০৩।

৯. 'ফের ঐতিহাসিক রায়: ব্যক্তিগত গোপনতা এখন মৌলিক অধিকার'. ২০১৭.আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ অগস্ট, পৃ. ৩।

১০. *The Constitution of India. 2009. Delhi- Professional Book Publishers– p.9.*

১১. গঙ্গোপাধ্যায়, অশোককুমার. ২০১৭. 'এই রায় ভাল, তবে কোন মৌলিক অধিকারই অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৪ অগস্ট, পৃ. ৩।

১২. Rishishwar– Satya. 2016. ''Recognition and Protection of LGBT Rights- LGBT rights in India- An Ignored Identity''– International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education– Vol-2 Issue-6– pp.1211-1212.

১৩. Lee Badgett– M. V. 2014. Op. cit.– pp.5-6.

১৪. '৩৭৭ নিয়ে কোর্টের দিকেই বল ঠেলল মোদী সরকার'. ২০১৮.আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ জুলাই।

১৫. '৩৭৭ ধারা সাংবিধানিক কি, দেখবে কোর্ট'. ২০১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুলাই।

১৬. 'অপরাধের দাগ উঠলে মন বদল'. ২০১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ জুলাই।

১৭. '৩৭৭-র পক্ষে নয় মুসলিম ল বোর্ড-ও'. ২০১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ জুলাই।

১৮. 'কংগ্রেস রায়কে স্বাগত জানালেও বিজেপি চুপচাপ'. ২০১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ সেপ্টেম্বর।

১৯. 'সমকামিতা অপরাধ নয়, ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের'. ২০১৮.আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ সেপ্টেম্বর।

২০. 'কংগ্রেস রায়কে স্বাগত জানালেও বিজেপি চুপচাপ', প্রাগুক্ত।

২১. সেন, শমীক. ২০১৮. 'আদালত ও বহু মানুষ'. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ অক্টোবর।

২২. 'সমকাম অপরাধ নয়, ঐতিহাসিক বায় শীর্ষ আদালতের'. ২০১৮.আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ সেপ্টেম্বর।

২৩. সেন, শমীক. 'আদালত ও বহু মানুষ'. প্রাগুক্ত।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়,অঞ্জন. ২০১৮. 'ধূসর বরফ মুছে লহমায় এল রামধনু রং', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ সেপ্টেম্বর।

২৫. 'সমকাম নিয়ে এত গেল গেল রব কেন?' ২০১৮ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ নভেম্বর।

২৬. Al Baset– Zaid. 2018. ''Supreme Court Judgment against Section 377- The Tasks Ahead''– Economic & Political Weekly– Vol. LIII– No. 39– September 29– p.15.

২৭. ঘোষ, সেমন্তী. ২০১৮ 'সুপ্রীম কোর্টের সমকামিতা রায়ে বিজেপির উদ্বেগের কারণ আছে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ সেপ্টেম্বর।

লেখক পরিচিতি

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া

Email ID.- biswanaths4@gmail.com